ceÜ

ঢেকে রাখা সত্যগুলো

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

অনেক সত্য আছে যেগুলো ঢেকে রাখার চেষ্টা হয়; তাদের কোনোটা হয়তো মৃত, কোনোটা জীবিত। কিন্তু জীবিতই হোক কিংবা মৃত, কোনো সত্যই গুরুত্বহীন নয়। গুরুত্বহীন হলে তারা হয়তো সত্যই হতো না। আবার এমনও মিথ্যা আছে বৈকি, যেগুলো সত্যের চেয়েও মূল্যবান। সত্যকে ঢেকে রাখার চেষ্টা তাদের দিক থেকেই করতে হয়, সত্য যাদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সত্য দীর্ঘদিন ঢাকা থাকে না। বের হয়ে পড়ে। যে কথাটা আমাদের বাংলা প্রবচনে ধরা পড়ছে, ওই যে যেখানে বলা হচ্ছে, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না।

সম্প্রতি কয়েকটি সত্যের উন্মোচন ঘটেছে যাদের সামাজিক তাৎপর্য বেশ ব্যাপক। যেমন সাভারে কর্মরত শ্রমিকসহ কারখানার মস্ত এক দালান ধসে পড়েছে, যাতে টের পাওয়া গেল দেশের শ্রমিকরা কেমন অরক্ষিত ও অনিরাপদ অবস্থার ভেতর কাজ করে। ওদিকে খাদ্যে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব ভেজাল ধরা পড়ার ঘটনা ধরিয়ে দিল যে, দেশের মানুষ কেবল খাদ্যের অভাব দ্বারা পীড়িত নয়, যা খাচ্ছে তার ভেতরকার বিষ দ্বারাও আক্রান্ত বটে।

সত্য আরো আছে। শ্রমিকের মৃত্যু এবং খাদ্যে ভেজাল, দুই ঘটনাই গণমাধ্যমে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তাই বলে

প্রিয় পাঠক একটি জীবনের জন্য আপনার অংশগ্রহণ চাইছি

গোলাম মোর্তোজা

পারভেজ চৌধুরী, পর্দার পেছনের মানুষ। এনটিভির 'শুভসন্ধ্যা' অনুষ্ঠানটি যারা দেখেন, তাদের সবার বক্তব্য গোছানো পরিকল্পিত চমৎকার একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটির রূপকার পারভেজ চৌধুরী। এরকম অনেক অনুষ্ঠানের পেছনে রয়েছে তার অবদান। এনটিভি'র নির্বাহী প্রযোজক। বর্তমান সময়ের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিভিন্ন সেক্টরে যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে অন্যতম প্রতিভান মানুষ পারভেজ চৌধুরী। এমন নির্ভেজাল, নির্বিরোধী, নির্মোহ মানুষ এই সমাজে বিরল। এক কথায় ভালো মানুষ বলতে যা বোঝায় তার প্রতীকী চরিত্র পারভেজ চৌধুরী। আমার, আমাদের শ্রদ্ধা, ভালোলাগা, ভালোবাসার মানুষ পারভেজ চৌধুরী। বয়স মাত্র ৩৬ বছর। শুধু কাজ আর কাজ নিয়ে থেকেছেন প্রতিটি মুহূর্ত। কখনো তাকাননি নিজের দিকে।

হঠাৎ করে হয়ে পড়েছেন গুরুতর অসুস্থ। তার হার্টের একটি ভাল্ব নষ্ট হয়ে গেছে। দেখা দিয়েছে আরো কিছু গুরুতর সমস্যা। এখন তিনি জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন। কিন্তু ডাক্তাররা বলেছেন দেশে তার চিকিৎসা সম্ভব নয়। দ্রুত পাঠাতে হবে বিদেশে, সিঙ্গাপুর অথবা ব্যাংককে। সিদ্ধান্ত হয়েছে পাঠানো হবে ব্যাংকক। এর জন্য প্রয়োজন প্রায় ২০ লাখ টাকা।

এনটিভি'র কর্মী, কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে ৫ থেকে ৬ লাখ টাকা। চ্যানেল আই (ইমপ্রেস গ্রুপ) তিনটি বিমান টিকেটের (পারভেজ চৌধুরী, সঙ্গে আরো দু'জন) ব্যবস্থা করেছেন। আরো ৫ থেকে ৬ লাখ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। যা অল্প সময়ের মধ্যে পাওয়া যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি। আরো প্রয়োজন প্রায় ৮ লাখ টাকা।

প্রিয় পাঠক এই লেখার উদ্দেশ্য আপনার সহযোগিতা। দেশ-বিদেশের পাঠকের ভালোবাসাই আমাদের কাজের অনুপ্রেরণা, সম্পদ। বহুবার, বহু বিপদে আপনারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তবে এইভাবে অতীতে কখনো আপনাদের সহযোগিতা চাইনি। এখন চাইছি কারণ পারভেজ চৌধুরীকে বাঁচাতে হবে। তার ছোট্ট বাচ্চা, স্ত্রীর পাশে দাঁড়াতে হবে, আমার আপনার সবাইকে।

আমি পারভেজ চৌধুরীর চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইছি না। চাইছি দেশের জন্য প্রয়োজনীয় একজন প্রতিভাবান মানুষের জীবন বাঁচাতে আপনার অংশগ্রহণ। কম বেশি পরিমাণ যাই হোক না কেন আপনার অংশগ্রহণ আজ খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে আমাদের। প্রিয় পাঠক সাড়া দিন, অংশ নিন...। আমরা তাকিয়ে আছি আপনার দিকে...।

পারভেজ চৌধুরীর চিকিৎসা তহবিলে সরাসরি অর্থ পাঠাতে পারেন। চাইলে সাপ্তাহিক ২০০০-এ অথবা ব্যক্তিগতভাবে (+৮৮০১৭৩০১৮৬১৭) আমার সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন।

পারভেজ চৌধুরী চিকিৎসা তহবিল
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর : ১৩৪০০০৬০১৪১
ওরিয়েন্টাল ব্যাংক, কারওয়ান বাজার শাখা, ঢাকা
swift code : BBSHBDDHXXX

বিপজ্জনকভাবে কারখানা তৈরি করতে শ্রমিক হত্যা ঘটানো, কিংবা খাদ্যে ভেজাল মিশিয়ে গণহত্যার আয়োজন করেছে যারা, তাদের যে উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে তা কিন্তু নয়। হয় না। শাস্তি হয় না। যে জন্য অপরাধের সংখ্যা ও মাত্রা দুটোই বাড়তে থাকে। ছিঁচকে চোর তবু হয়তো ধরা পড়ে কিন্তু রাঘববোয়ালদের স্পর্শ করাই সম্ভব হয় না। যে যত বড় অপরাধী, সে তত স্বাধীন বললে বোধ করি অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলাদেশ ক্রমেই অপরাধীদের জন্য অভয়াশ্রম হয়ে উঠছে।

গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে মজুরি, পরিবেশ, নিরাপত্তা সবকিছু অত্যন্ত নিম্নমানের। এই শিল্পে নারী শ্রমিকের যে আধিক্য তার কারণ নারী সমাজকে ক্ষমতাবান করার ইচ্ছা নয় কারণ হচ্ছে। তাদের বঞ্চিত করাটা সহজসাধ্য। পুরুষ তবুও নড়াচড়া দেবে বলে আশঙ্কা করা যায়। মেয়েদের নিয়োগ করলে সে ঝুঁকিটা কম। গার্মেন্টস কারখানাগুলো যে বিপজ্জনক তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই, কিন্তু তবু ওই শিল্পে শ্রমিকের কোনো অভাব হয় না। তার কারণ দেশে লাখ লাখ মানুষ বেকার।

বেকারত্ব হচ্ছে আজকের দিনে বাংলাদেশে প্রধান সমস্যা। কিন্তু সেটা খেয়াল করা হয় না। সরকার আসে, সরকার যায়। বছরে বছরে নতুন নতুন বাজেট ঘোষণার খেলা চলতে থাকে, কিন্তু বেকারত্ব কমে না। তার কারণ দেশের শাসক শ্রেণী লুণ্ঠন বোঝে, যথার্থ বিনিয়োগ বোঝে না। তারা মুনাফা খোঁজে, উৎপাদনের কথা ভাবে না। বেকারের সংখ্যা এতো বেশি যে, শ্রমিকের কোনো অভাব ঘটে না। একজন চলে গেলে দশজন বেপরোয়াভাবে ঠেলাধাক্কা করে প্রবেশের জন্য। কাজের শর্ত, মজুরি, ঝুঁকি, পরিবেশ কোনো কিছুকেই তারা বিবেচনার ভেতর আনার সুযোগ পায় না।

সাভারে কারখানা ভবনটি তৈরি হয়েছিল অবৈধভাবে। কাজটা যারা করেছে তারা টাকাওয়ালা। টাকাওয়ালারা যত টাকা করে তত তাদের ক্ষমতা বাড়ে। তারা বিনা উপদ্রবে অবৈধ কাজ করে। ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা তৈরির ব্যাপারে এটা সত্য। সত্য খাদ্যে ভেজাল মেশানোর বেলায়ও।

রয়েছে মুনাফার লালসা। মুনাফার লোভ লালসায় পরিণত হয়েছে। ওটাই তখন মূল চালিকাশক্তি। আইনশৃঙ্খলার ভয়ঙ্কর অবনতি, দুর্নীতি, ছিনতাই, রাহাজানি থেকে শুরু করে রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পর্যন্ত সবকিছুর পেছনেই কাজ করছে মুনাফার দুর্দমনীয় লালসা। একে নিয়ন্ত্রণ করবে এমন কোনো শক্তি দেশে নেই। উল্টো নিজেই সবিকছু আপন নিয়ন্ত্রণের ভেতর নিয়ে এসেছে।

প্রতিক্রিয়া? কারখানার ছাদ ভেঙে পড়ে, অগুনতি শ্রমিক মারা যায়। প্রতিক্রিয়াটি কী? হ্যাঁ, প্রতিক্রিয়া হয়েছে। গণমাধ্যমে ছবি এসেছে। বড় বড় মানুষেরা সদলবলে ছুটে গেছেন ঘটনাস্থলে, গিয়ে উদ্ধাকাজে বরঞ্চ বিঘ্নেরই সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু স্থায়ী কোনো প্রতিক্রিয়া তো দেখা গেলো না। উদ্ধারকাজে সাহায্য করতে পারে এমন যন্ত্রপাতি যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে ছিল তারা যে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে এগিয়ে আসবে এমনটা ঘটেনি। শ্রমিকদের নিরাপত্তার প্রশ্নকে উচ্চমূল্য দিয়ে বড় রাজনৈতিক দল দুটির কোনোটিই এগিয়ে আসেনি। সরকারি দল তো আসবেই না; তাদের তো সব সময়ই মালিকদের পক্ষেই থাকার কথা এবং সেখানেই তারা ছিল। বিরোধী দলকেও দেখা গেলো না শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াতে। বোঝা গেলো আসলে তারা একই পক্ষ, মালিক পক্ষ; এবং সেই হিসেবে অবশ্য শ্রমজীবী মানুষের শত্রুপক্ষ। সরকার এবং সরকারবিরোধী দুই দল নিয়েই এ দেশের শাসকশ্রেণী গঠিত। তারা উভয়েই রক্ষক এবং রক্ষক হবার অধিকার ও সুযোগে তারা ভক্ষক। রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তাহলে জনগণের অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায় তার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি নিদর্শন পাওয়া যাবে আমাদের এই বাংলাদেশে। যদি কেউ তা পেতে চায়।

ইতিমধ্যে আরো এক বিস্ফোরণ ঘটেছে। বোমা ফেটেছে। একটি নয়, দুটি নয়- শত শত; এক সঙ্গে পাঁচশ'। মনে হচ্ছিল বোমারুরা ভয় দেখাচ্ছে। পরে তারা আরো এক ডিগ্রি এগিয়ে গেছে। আদালত প্রাঙ্গণে বিচারক ও বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের কয়েকজনকে আহত তো বটেই, হত্যাও করেছে।

এও এক উন্মোচন বটে। অত্যন্ত সশব্দ উন্মোচন। সরকারের দিক থেকে জোর গলায় বলা হচ্ছিল যে, দেশে ইসলামী জঙ্গি বলে কিছু নেই, সবটাই খবরের কাগজওয়ালদের প্রপাগান্ডা। খবরের কাগজওয়ালারা অবশ্য কেবল কথায় নয়, ছবি দিয়েও প্রমাণ করে দিয়েছেন যে জঙ্গিরা আছে, তারা মানুষ হত্যা করছে, হত্যা করে লাশ ঝুলিয়ে রাখছে গাছে। বিভাগীয় শহরে এসে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করছে গাড়িবহরে ঘোরাফেরা করে। সরকারের কণ্ঠে জোর বেশি, তাই অন্য কণ্ঠ ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে, বাধ্য হয়ে। কিন্তু এক পর্যায়ে জঙ্গিদের বোমাগুলো এত বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং তাদের প্রস্তুত ও মজুদকারীদের পক্ষে তাদের যারা নিয়োগ করেছে তাদের কানে নিজেদের তৎপরতার আওয়াজটা পৌঁছে দেয়া এমনই অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে যে তাদের পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হয়নি। তারা আওয়াজ দিয়ে বলেছে, আমরা আছি এটা মিথ্যা নয়। আছে তো বটেই, কর্মরত অবস্থাতেই রয়েছে। নিরুপায় সরকারি কর্তৃপক্ষ, তারা আর কী করবে, ধর ধর বলে ধাওয়া দিয়েছে। ধরেনি যে তাও নয়। ধরেছে, অনেক জঙ্গি ধরা পড়েছে। কিন্তু সবগুলোই হচ্ছে আন্ডাবাচ্চা, আসল যারা তারা রয়ে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরেই।

কারা যে আসল সেটাও আর লুকানো নেই। সবাই তাদের নাম জানে, চেহারাও চেনা। ধরিয়ে দিন, পুরস্কার পাবেন- বলে বিজ্ঞাপন বের হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই ধরা পড়ছে না। এর অর্থ কি এই যে, তাদের ধরা হচ্ছে না? নাকি তারা এমন জায়গায় আছে যারা ধরবেন তারা সেখানে প্রবেশ করতে সাহস পান না। পিছিয়ে আসেন? জনমনে এসব প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক এবং জেগেছেও বটে।

যেসব জঙ্গি ইতিমধ্যেই ধরা পড়েছে তারা নিজেদের পরিচয় গোপন রাখেনি। তারা প্রায় সবাই বলেছে, দেশে সবচেয়ে বড় ধর্মভিত্তিক যে রাজনৈতিক দলটি কার্যরত রয়েছে এবং বর্তমানে সরকারি দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ সেটির সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে তারা জড়িত। সেটা একটা ব্যাখ্যা হতে পারে- কেন জঙ্গিদের আসল মুরব্বিরা ধরা পড়ছে না। ধরা পড়লে অনেক কিছুই স্পষ্ট হতো। এরা কারা, কেন এসব করছে তা জানা যেত। কোথা থেকে টাকা আসছে তাও আমরা বুঝতে পারতাম।

টাকার এই উৎসটা জানা খুবই জরুরি। কেননা টাকার যে বিনিয়োগ ঘটেছে তার পরিমাণ মোটেই সামান্য নয় এবং যারা এই বিনিয়োগ ঘটিয়েছে তারা আর যাই হোক, বাংলাদেশের মিত্র যে নয় তা বুঝতে কোনো কষ্ট হবার কথা নয়। টাকা দিয়ে বিস্ফোরক তৈরির আস্ত আস্ত গোপন কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। তাতে কম টাকা লাগেনি। অবশ্য তারচেয়ে বহু বহু বেশি টাকা খরচ করা হয়েছে শত শত জঙ্গি উৎপাদন, প্রশিক্ষণ এবং পরিচালনার ব্যাপারে। একদা যে ছেলেটি টোকই ছিল, জঙ্গি হয়ে সে মাসিক বেতন যদি পেয়ে থাকে পনেরো হাজার টাকা, তাহলে শত শত জঙ্গি পুষতে কত টাকা দরকার হয়েছে তা হিসাব করতে গেলে মাথাটা ঘুরে যাবে। উচ্চতর পদে যারা অধিষ্ঠিত তাদের বেতন-ভাতা নিশ্চই অধিক ছিল। সরকারে নানা শাখা-প্রশাখায় এই শত্রুপক্ষের চরেরা কর্মরত বলে জানা যাচ্ছে, তাদের পেছনেও নিশ্চয়ই নিয়মিত টাকা ঢালতে হয়েছে।

ধরা পড়া জঙ্গিরা সবাই হতদরিদ্র। আবারও সেই বেকার সমস্যার কাছেই গিয়ে হাজির হচ্ছি। বেকার কিশোর তার সামনে কোনো ভবিষ্যৎ দেখে না, সবটাই আর কাছে অন্ধকার। সে যখন টাকার গন্ধ পায় এবং পরকালে বেহেস্ত পাবে বলে ভরসা করতে শেখে তখন সহজেই জঙ্গিদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে এবং জোয়াল তুলে কাঁধে নেয়।

জঙ্গি তৎপরতার পেছনের রহস্য অবশ্য এখনো সবটা পরিষ্কার হয়নি। আসল দুর্বৃত্তরা ধরা পড়লে সেটা উন্মোচিত হবে বলে আশা করা যায়। তবে ধারণা করা কঠিন নয় যে, এরা কাজ করবে সাম্রাজ্যবাদের চর হিসেবে। সাম্রাজ্যবাদীরা চায় আমাদের এ দেশকে দুর্বল করবে

রাখতে, যাতে এখানে তাদের আধিপত্য থাকে। এখানকার সম্পদ যা আছে তা তারা হস্তগত করতে আগ্রহী। স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থা পঙ্গু করে দিতে পারলে তাদের সুবিধা, নিজেদের পণ্য এখানে বিক্রি করা যাবে। এবং এখানকার মানুষকে তাদের ওপর নির্ভরশীল অবস্থায় রাখা সম্ভব হবে। চীন এখন শক্তিশালী হয়ে উঠছে, তাকে মোকাবেলা করবার জন্য বঙ্গোপসাগরে ঘাঁটি করতে পারলে সুবিধা, সেই বিবেচনাটাও নিশ্চয়ই কাজ করছে। অর্থাগমনের সূত্র ওই সব বিবেচনার ভেতর নিহিত থাকাটা খুবই সম্ভব। তদুপরি মধ্যপ্রাচ্যের টাকাওয়ালারা আছে। যারা হয়তো মনে করে ইসলাম প্রচারের জন্য জঙ্গিদের ওপর নির্ভরতাই উৎকৃষ্ট উপায়।

জঙ্গিরা পড়াশোনা যতটুকু করেছে সেটা মাদ্রাসাতেই। সে শিক্ষা তাদেরকে যে কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করতে পারেনি, তা তাদের আচরণ থেকেই বোঝা যায়। মাদ্রাসা শিক্ষার অর্থনৈতিক উপযোগিতা যে নেই তা স্পষ্ট। উপরন্তু ওই শিক্ষা যে অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে তার সবচাইতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে পাকিস্তানে মৌলবাদীদের তৎপরতায়। যে জন্য একদা যে রাষ্ট্র ওই বিশেষ ধরনের নিষ্ঠাকে মহোৎসাহে উৎসাহিত করতো সে রাষ্ট্রই আজ তাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

গরিবের ছেলেমেয়েরাই মাদ্রাসায় যায়, গিয়ে বেকার হয় এবং তাদেরই একাংশ হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় জঙ্গি তৎপরতায় যোগ দেয়। এই মাদ্রাসা শিক্ষায় এখন বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ চলছে এবং তার বড় ভাগ আসছে আমাদের বিদেশী শত্রুদের কাছ থেকে। এই বিনিয়োগে স্থানীয়রাও অংশ নেয়; কেউ নেয় না বুঝে, অধিকাংশ নেয় পুণ্য ও সুনামের আশায়। বিশেষ করে তারা, যারা অন্যায় পথে বিস্তর টাকা করেছে। সরকারগুলোও দেখা যায় মাদ্রাসা শিক্ষার বিস্তারে যতটা উৎসাহ বোধ করে, মাধ্যমিক শিক্ষার বেলায় ততটা করে না। এরা শিক্ষা বাড়ুক এটা চায় না। চায় অনুগত ও পঙ্গু মানুষ তৈরি হোক, যারা তাদের সময়মতো ভোট দেবে এবং কখনোই সমালোচনা করবার মতো জ্ঞানবুদ্ধি লাভ করতে সমর্থ হবে না।

বর্তমান সরকার অবশ্য আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবার উদ্যোগ নিয়েছিল; তথাকথিত 'একমুখী' শিক্ষা প্রবর্তনের আড়ালে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঠেলে মাদ্রাসার স্তরে নামিয়ে দিয়ে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে একটি 'সমন্বয়' ঘটাবার চেষ্টা করছিল। এ ক্ষেত্রে তারা ইতিমধ্যেই বেশ বড় ধরনের বিনিয়োগ ঘটিয়ে ছেড়েছে। দেশের নাম করে বিদেশী ব্যাংকের কাছ থেকে ধার এনে ৪৯০ কোটি টাকা শেষ করেছে: পুস্তক প্রকাশকদের কয়েকশ' কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে নতুন বই প্রকাশ এবং পুরাতন বই বাজে কাগজের দরে বিক্রি করে গুদাম খালি করার খাতে। বিনিয়োগ আরো এগুতো। যদি প্রতিরোধ গড়ে না উঠতো।

সরকার কাজটা গোপনেই সাঙ্গ করতে চেয়েছিল। কিন্তু দেশের মানুষ ব্যাপারটা কী ঘটতে যাচ্ছে টের পেয়ে শিউরে ওঠায় আর এগুতে পারেনি; আপাতত রণে ভঙ্গ দিয়েছে। ইংরেজি মাধ্যমের ছেলেমেয়েরা যেখানে পড়ছে ২০০ নম্বরের পদার্থবিজ্ঞান, ২০০ নম্বরের রসায়ন, সেখানে বাংলা মাধ্যমের স্কুলে একটি নয়, ওই দুটি বিষয়ের জন্য একত্রে সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ৭৫ নম্বর। অপরদিকে ধর্মশিক্ষাকে করা হয়েছিল বাধ্যতামূলক। তার সঙ্গে আবার যোগ করা হয়েছিল ধর্মীয় ভাষা শিক্ষা। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে প্রতি বিষয়ে ৩০ নম্বর ছেড়ে দিয়ে পাসের হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষকদের পক্ষপাতিত্বের দোষে অভিযুক্ত ও দুর্নীতিগ্রস্ত হতে প্ররোচিত করবার আয়োজনও করা হয়েছিল।

দেশবাসী অবশ্যই একমুখী শিক্ষা চায়; কিন্তু সেই একমুখী শিক্ষা মাধ্যমিক মাদ্রাসা পর্যায়ে নামিয়ে আনা নয়; তারা চায় ইংরেজি, বাংলা এবং মাদ্রাসা- এই তিন ধারার শিক্ষা এক ধারায় আনা; যে একএকরণের ভিত্তি হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বপ্রকার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা। মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া শিক্ষা যে যথার্থ হয় না তা সর্বমহলেই স্বীকৃত। আমাদের সংবিধানেও ওই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার রয়েছে। কিন্তু যা গড়ে উঠেছে তা হলো একটি তিনমুখী ব্যবস্থা। সরকার চাইছিল তিনমুখীকে দুইমুখী করতে। যার একটি হবে ইংরেজি মাধ্যমে, অপরটি মাধ্যমিক মাদ্রাসার। সমাজে যেমন ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর বিভাজনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার নির্মম প্রচেষ্টা চলছে, শিক্ষা ক্ষেত্রকেও সেই চেষ্টারই অংশ হিসেবে ব্যবহার করাটাই ছিল সরকারের অভিপ্রায়।

সত্য এটাও যে, ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক সামাজিক বিনিয়োগ ইতিমধ্যেই ঘটেছে এবং তা ক্রমাগত বাড়বে। এই শিক্ষা থেকে যারা বের হয়ে আসার এবং আগামীতে আসবে তারা দেখতে-শুনতে যেমনই হোক না কেন, ভেতরে হবে ফাঁপা ও উৎপাটিত। বাবা-মা অবিরাম পয়সা ঢেলে এই রকমের মানুষ তৈরিতেই ব্যস্ত রয়েছেন।

বিনিয়োগ ঘটেছে মোবাইল ও টেলিফোনে। দেশী নয়, বিদেশী মোবাইল টেলিফোন কোম্পানিগুলো চেষ্টা করছে কেবল হুজুগ নয়, নেশা তৈরি করতে। এই নেশা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে। আগামীতে তা আরো বাড়বে বলে আশঙ্কা। দিনে খরচ মিনিটে চার টাকা; রাত ১২টার পর থেকে ভোর পর্যন্ত ফ্রি- বিশেষ বিশেষ কোম্পানির এই ব্যবস্থা ধরিয়ে দিচ্ছে এদের সবার অভিসন্ধিকে। এরা চাইবে লোকে আসক্ত হোক, রাতের অভ্যাসকে দিনেও নিয়ে আসুক, দিনে ঘুমিয়ে রাতে জাগুক, সৃষ্টিশীলতা ভুলে ইয়ার্কি-ফাজলামি-আড্ডাবাজিতে ব্যস্ত থাকুক এবং ক্রেতা ও ব্যবহারকারী হোক মোবাইল ফোনের। উদ্দেশ্য মুনাফা বৃদ্ধি। তাদের মুনাফা বাড়বে এবং সে মুনাফার কনা পরিমাণও দেশে থাকছে না, সবটাই বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। জঙ্গি তৎপরতা অনাধুনিক, মোবাইল ফোন আধুনিক। কিন্তু দুয়ের উদ্দেশ্য একই, দেশকে বিদেশীদের অধীনে রাখা। এটাও তাৎপর্যহীন নয় যে, জঙ্গিরা তাদের কার্যক্রমে মোবাইল ফোনকে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করছে।

শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদন্ড ভেঙে দেবার সরকারি প্রচেষ্টা থেকে দেশবাসী আপাতত রেহাই পেয়েছে। কোনো দৈব কারণে নয়, প্রতিরোধের কারণে বটে। সরকার বলছে স্থগিত করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু বাতিল করা হয়নি। আমরা জানি বাতিলও হবে, যদি প্রতিরোধ শক্ত হয়। আসল কথা ওটাই; প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এ ক্ষেত্রে যেমন সব ক্ষেত্রেই তেমনি। কিন্তু প্রতিরোধ কে গড়বে? এগিয়ে আসতে হবে মধ্যবিত্তকেই। শিক্ষার ব্যাপারটাতে সেটাই আমরা দেখলাম। আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত অনেকাংশেই শিক্ষানির্ভর, শিক্ষার ওপর হাত পড়লে সে আতঙ্কিত হয় প্রতিবাদ করে। কিন্তু কেবল মধ্যবিত্তের প্রতিরোধে বিজয় আসে না। সরকার নতুন শিক্ষা কার্যক্রম কিছুতেই গুটিয়ে নিত না যদি সামনে নির্বাচন না থাকতো। নির্বাচনের সময় মধ্যবিত্ত যদি আন্দোলনে নামে তবে তার প্রতিক্রিয়া পড়বে ভোটের ওপর। ভয় ছিল সেটাই। ভোটের ভয়, অর্থাৎ জনগণের ভয়।

মধ্যবিত্তকে তাই সঙ্গে নিতে হবে জনগণের। তবেই জয় আসবে। যেমন অতীতে এসেছে। যেমন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে এসেছিল। যার সামনে ছিল মধ্যবিত্ত, কিন্তু যাতে সমর্থন ছিল দেশের সব মানুষের।

তবে ঐক্যই যথেষ্ট নয়; স্থায়ী ঐক্য চাই। যাতে করে উৎপাতগুলো ঘুরেফিরে বারবার না আসে। ক্ষতিকর পুরাতন সত্যগুলো মিথ্যা করে দিয়ে যাতে কল্যাণকর নতুন সত্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। সৃষ্টিশীল সেই কাজের জন্য সমষ্টিগত স্বপ্ন আবশ্যক। আমাদের স্বপ্নগুলো সব ব্যক্তিগত হয়ে পড়েছে। স্বপ্ন ব্যক্তি দেখে, দেখবেও। কিন্তু তাদের দুঃস্বপ্নে পরিণত হওয়া থেকে বাঁচানো দরকার। বাঁচানোর জন্য চাই সমষ্টিগত স্বপ্ন, অর্থাৎ লক্ষ্য। লক্ষ্য হওয়া দরকার রাষ্ট্র ও সমাজকে প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক করা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে অধিকার ও সুযোগের সাম্য। যে জন্য রাষ্ট্রকে হতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজকে এগুতে হবে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে। দরকার হবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। দেশে ক্ষমতার বড়ই মঙ্গা। অধিকাংশ মানুষই ক্ষমতাবঞ্চিত, যেটুকু আছে তা শাসকশ্রেণীর কুক্ষিগত। ক্ষমতাকে ওখান থেকে ছাড়িয়ে এনে ছড়িয়ে দিতে হবে সবার মাঝে, যাতে করে কেউ মস্তবড় ক্ষমতবান হয়ে উঠতে না পারে এবং অন্যরা বঞ্চিত না হয়।